শুভ নববর্ষ। সবাকে বৈশাখী শুভেচ্ছা। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ বাঙলা নববর্ষ। বৈশাখ ১৪১৩বাঙলা তার যাত্রা শুরু করেছে ১৪ এপ্রিল ২০০৬ইং (শুক্রবার)। আমাদের পুরোজাতিসহ বিশ্বের সকল প্রবাসী বাঙলাভাষাভাষীগন আজ মুলউৎসের সন্ধানে বাঙলা বর্ষবরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। পাঠক বন্ধুদের বাঙলা নববর্ষে চৈতীফুলের গন্ধভরা শুভেচ্ছা দিচ্ছি। পুরো বছর জুড়ে আপনার সুস্বাস্থ্য ও সফলতা কামনা মরুপলাশ এর পক্ষ থেকে।

আজকের এই বিশেষ দিনটিতে আমরা একটু সিরিয়াস্লী নজর দিচ্ছি.... উত্তর বঙ্গের কানসাট এলাকার ঘটনায় আমরা প্রবাসীরা তীব্রভাবে উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। এবার তাদের বৈশাখ এসেছে মানে বাঙলা নববর্ষ এসেছে পুলিশের বর্বর হামলা এবং হয়রানির মাধ্যমে। যারা তাদের স্বজন হারিয়েছেন, তাদেরকে আমরা 'মরুপলাশ', 'মোহনা', এবং 'রুপসী চাঁদপুর' এর সকল লেখকদের পক্ষ হতে সমবেদনা জানাই। পুলিশী বর্বর হামলার জন্যে আমাদের প্রবাসীদের সারাজীবনের সঞ্চিত সকল নিন্দার শব্দগুলো ছুড়ে মারছি!!!! ৬৮ হাজার গ্রামের সকল শ্রমজীবি মেহনতি মানুষকে এ গর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান করছি। জয় হোক সকল মেহনতি মানুষের।

নববর্ষের অনেক লেখাই পেয়েছি তবে তা অনেক দেরীতে। সে সম্পর্কে চাঁদপুরের চিঠিতে পাঠকদের কিছুটা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। যাই হোক আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করতে লেখাগুলো ওয়েবে তুলে দিলাম।
সবার জন্যে থাকলো আবারও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

প্রকাশনার ১৯ বছর

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
রুপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।
১লা বৈশাখ ১৪১৩বাঙলা
১৪এপ্রিল ২০০৬ইং

Email: marupalash@gmail.com
marupalash@yahoo.com
www.marupalash.com

বৈশাখের এই বিশেষ আয়োজনে যে সকল লেখক বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করেছেন....প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন (প্রবন্ধ এবং একগুচ্ছ কবিতা), এ এফ এম ফতেউল বারী রাজা (প্রবন্ধ), ইদ্রিস আলী মেহেদী, সেলিনা জাহান (এ দু'জনেই লিখেছেন কবিতা) ও দেওয়ান আবদুল বাসেত।

পহেলা বৈশাখ নববর্ষ ও বর্ষপঞ্জির ইতিকথা

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

আর দশটা বিকেলের মত একটা সাদামাটা বিকেল। লাল সুর্যটা ঠিক পোড়া রুটির মত আকার ধারণ করেছে। ২৪ ঘন্টার এই সময়টা দিন আর রাতের মিলনের সময়। আর তাই কিছুটা উদাসীনতা মানুষকে কেমন যেন আনমনা করে দেয়। নীল একটা মলাটের বই হাতে নিয়ে বারান্দার দোলনায় দোল খাচ্ছে একজন তরুনী। হঠাৎ তার চোখ পড়ে নিচের দিকে। একখানা কালোগাড়ি এসে বাসার সামনে থামল। হালকা নীল রঙের স্যুট পরা এক যুবক বাসার সিঁড়িতে পা রাখল। চমৎকার সুন্দর সপ্রতিভ যুবক। ক্ষণিকের জন্যে চোখ বন্ধ করতেই মনে পড়ল গত বছরের কথা। গায়ের ফর্সা রঙের সাথে বেগুনী পাঞ্জাবী পরা এক তরুণ বকুল তলায় দরাজ গলায় গান ধরেছে 'এসো এসো হে বৈশাখ' গানটি তৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলো স্বপ্নলোকে। তৃষ্ণার উদাসীনতা হঠাৎ বদলে গেল। মনে পড়ে গেল আবীরের সাথে তার প্রথম পরিচয়ের কথা। তরুন আবীর গত বৈশাখে বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী পরে ১লা বৈশাখ ১৪১২ বাং তার মন কেড়ে ছিলো কাল বৈশাখীর মতোই তাকে ভালোবাসার কথা শুনিয়ে ছিল আবীর। মাত্র দু'দিন পর ফিরে আসবে সে পহেলা বৈশাখ। বর্ষবরণের নানা অনুষ্ঠানে ওরা সবার সাথে মিশে একাকার হবে, তখন তার পরনে নীল স্যুটের বদলে বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী থাকবে, তৃষ্ণার পোশাক হবে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। ওরা দু'জন হবে স্বপ্নের রাজপুত্র -রাজকন্যা। তাদের চার পাশে শুধুই আনন্দলোক শুধু তারা নয় সকল বাঙালী সারা দেশ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করবে বাংলা নববর্ষ। চারদিকে লাল পাড়ের সাদা শাড়ী আর বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী পরা তরুন -তরুনীর দল। ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত , ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ সার্বজনীন বাঙালী উৎসব। তৃষ্ণাকে আন্দোলিত এই নববর্ষ। তৃষ্ণা আবীরের মতো কোটি কোটি বাঙ্গালীর প্রিয় দিন পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। অন্যদিকে পহেলা জানুয়ারীতে আমাদের দেশে উদযাপিত হয় অবশিষ্ট খ্রীষ্ট বা ইংরেজী নববর্ষ। পহেলা বৈশাখের মতো সেদিন সরকারি ছুটি থাকে না, তবে পুর্ববর্তী রাতের মধ্যপ্রহরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারে নগরীর কিছু মানুষ বেশ ঘটা করে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন করবে, আতশবাজী পোড়াবে, উদ্দাম ব্যান্ড আর হৈ চৈ করে রাতটি তারা কাটিয়ে দেবে।

থার্টি ফার্স্ট নাইট , বাংলা, বাঙ্গালীকে নাড়া না দিলেও, দিনক্ষণ তারিখের হিসেবের জন্যে বাঙ্গালীরা এখনও নির্ভর করে এই বর্ষপঞ্জিটির ওপর। জাতীয় জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খ্রীষ্টিয় সালের দিনপঞ্জির উপর নির্ভরশীল। যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর। ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত অনেকের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য কালচারে আসক্ত লোকজনের বেলেল্লাপনা। পহেলা জানুয়ারিতে সরকারি ছুটি না থাকলেও এই ইংরেজী সাল বা খ্রীস্টাব্দ অনুযায়ী আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। বর্ষপঞ্জির বিচারে আমরা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান এক জাতি। আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নয়, একাধারে তিনটি কাল বা ক্যালেন্ডার প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই তিনটি সাল হলো খ্রীষ্টাব্দ , বঙ্গাব্দ এবং হিজরী সন। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই তিনটি সালের ভুমিকা অপরিসীম। এই ক্যালেন্ডার বর্ষপঞ্জি আমাদের জীবনে কিভাবে এলো সে কথাই এই প্রবন্ধে আমরা আজ জানতে চেষ্টা করবো। সৌর বর্ষ ও চন্দ্রবর্ষের উৎপত্তি এবং যোগ সুত্র নিয়ে আমরা আলাপ করবো । কাজটি আমরা শুরু করতে চাই সময় গণণার পথ ধরে। পশ্চিম বিশ্বে একটি সম্পূর্ণ দিন আর একটি সম্পূর্ণ রাতের পুর্ণচক্রের মেয়াদ ছব্বিশ ঘন্টা আমাদের বাংলায় অষ্টপ্রহর। চলুন জানতে চেষ্টা করি ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি ও জন্ম রহস্য নিয়ে।

ক্যালেন্ডার কথা

ঠিক ঠিক দিন তারিখ জানতে আমরা ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাই। কিন্তু এই ক্যালেন্ডার কে কবে আবিষ্কার করেছিল তা কি আমাদের জানা আছে ?
ক্যালেন্ডার আবিষ্কার হয় সেই সুপ্রাচীনকালে। তখনকার মানুষ সুর্যের উদয়-অস্ত দেখে সর্বপ্রথম অনুভব করে যে, সকাল-সন্ধ্যা নির্ভর করে সুর্যের ওপর। বহু বছর পর দিনক্ষণকে ডিঙিয়ে মানুষ চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে শুরু করল মাস গণনা। তারপর ঋতু পরিক্রমার হিসাব করে শুরু করল বছর গণনা।

এ হিসাব ধরে রাখতে গিয়ে সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডার আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন মিসরে। ক্যালেন্ডার প্রকাশের ফলে মানুষ জানল ১২ মাসে এক বছর আর ত্রিশ দিনে এক মাস। এভাবে বছর শেষে বাড়তি দিন জুড়ে বছরের হিসাব দাঁড়াল ৩৬৫ দিন। তখনকার দিনে গ্রিসের হিসাব অবশ্য চান্দ্রমাসে হতো। তাদের হিসাব ছিল প্রতি আট বছর অন্তর দিন-মাস যোগ দেওয়া। ৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আদেশে ক্যালেন্ডারের সংস্কার কাজ সর্বপ্রথম শুরু হয়। এ কাজে সাহায্য করেন আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ সোমি গেনিস। এই ক্যালেন্ডার তৈরি হয় সুর্যের চারদিকে পৃথিবী পরিক্রমার ওপর নির্ভর করে। এর নাম দেওয়া হয় সৌর বছর। সোমিগেনিস ঠিক করলেন প্রতি বছরে থাকবে ৩৬৫ দিন এবং চার বছর অন্তর বছর হবে

৩৬৬ দিনের। কারণ প্রতি বছর যে কতিপয় ঘন্টা বাদ যাচ্ছে চার বছর অন্তর ওই বাদ যাওয়া ঘন্টা মিলে একটা দিনের সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বছরের নাম হলো লিপ ইয়ার। বছরের ১২ মাসের মধ্যে ৭টি মাস ৩১ দিনের আর চারটি ৩০ দিনের এবং অবশিষ্ট মাস ২৮ দিনের। শুধু লিপ ইয়ারে এ মাস হবে ২৯ দিনের। সুদীর্ঘ ১৬০০ বছর এ ক্যালেন্ডার চালু থাকার পর ১০ দিনের গন্ডোগোল ধরা পড়ে পৃথিবীর সূর্যের প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫.২৪২২ দিন। অথ্যাৎ ১০০০ বছরে সাত দিন অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। এই গোজামিল ঠিক করতে ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি ঠিক করলেন, শতাব্দীর যে বছর ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হবে না সে বছর লিপ ইয়ার হবে না। অথ্যাৎ সে বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনের হবে। এর ফলে ১৮০০, ১৯০০, ২১০০ এ বছরগুলো লিপ ইয়ার হবে না। এই ক্যালেন্ডার গ্রেগরি ক্যালেন্ডার হিসাবে পরিচিত।

১৫৭২ সালে তৃতীয় গ্রেগরি পোপ নিযুক্ত হওয়ার পর খেয়াল করে দেখলেন যে, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৫৪৫ সালের মধ্যেই মহাবিষুব বা Vernal Equinox দশ দিন সরে গেছে। ফলে পবিত্র ইস্টারের দিনও গেছে পালটে। কারণ জুলিয়ান সৌরবর্ষ প্রকৃত সৌরবর্ষের তুলনায় ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড বেশী। প্রতি বছর এইসময় বেড়ে বেড়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। প্রতি চারশো বছরে বেড়ে গেছে ৩.১২ দিন। তাই ১৫৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক হল মহাবিষুব বা ভার্নাল ইকুইনক্সকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ২১ মার্চ। সৌরবছরের মান ঠিক করা হল ৩৬৫.২৪২২। চালু হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। ১৭৫২ সালে আমেরিকায় জুলিয়ান বাতিল করে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জী চালু করার সময় দশটা দিন বাদ দিতে হল ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে। আপাততঃ গ্রেগরির নামাঙ্কিত এই বর্ষপঞ্জী সাধারনভাবে চালু থাকলো। এরমধ্যে অবশ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সময় চালু করা হয় এক নতুন ক্যালেন্ডার। ১৭৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হওয়া ফরাসি প্রজাতন্ত্রের বর্ষপঞ্জী বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। সময় অর্থাৎ সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, পল, দন্ড, পহর হিসাবে পৃথিবীর সম্পূর্ণ এক আবর্তন কে ভাগ করা হয়। তবে সময় গণনার একক এক এক দেশে এক এক রকম। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে অষ্টপ্রহর মিলে একদিন হয়। মজার কথা হলো, পশ্চিমের এই চব্বিশ ঘন্টার মূলে ছিল সুমের সভ্যতার ব্যবাহার করা বিখ্যাত সংখ্যা ১২ দিন। আর রাতকে ওই ১২ঘন্টায় ভাগ করেই ২৪ ঘন্টার উৎপত্তি। সুমের ব্যবিলনের মানুষ মহাকাশকে ভাগ করেছিল ১২ টি নক্ষত্রমন্ডলী অনুসারে, প্রতিটি মন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল কিছু কমবেশী ৩০ ডিগ্রি জায়গা। ফলে ৩৬০ ডিগ্রির বৃত্তের আকাশ পটে জেগে থাকতো এক অপূর্ব রাশিচক্র। বছরকেও ভাগ করা হয়েছিল ১২ মাসে। কিছু কমবেশী ৩০ দিন নিয়ে একটি মাস। সূর্য আর চাঁদের গতিপথ নিয়ে সে এক মহৎ আষ্কিারের গল্প।

বর্ষপঞ্জি যেভাবে সৃষ্টি হলো!

একদিকে যেমন দিনকে ভেঙ্গে ফেলা হল অন্যদিকে কয়েকটি দিন মিলিয়ে ‘গুচ্ছ’ তৈরী করার কাজও করেছে প্রাচীন সভ্যতার বৈজ্ঞানিকের দল। অবশ্য এই দুটো কাজ সে করেছে নিজের প্রয়োজনে, একান্তই নিজের সুবিধা অনুযায়ী। প্রকৃতির অনুশাসন এক্ষেত্রে তাকে মানতে হয়নি। দু’টি হাটবারের মাঝে যে ক’টা দিন পড়ে তাই নিয়ে একটা গুচ্ছ ভাবা যেতে পারে অত্যন্ত সহজেই। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে এই গুচ্ছ হল চারদিনের, আসিরীয় সভ্যতার সুবিধা ছয়দিনের গুচ্ছে, প্রাচীন মিসরে দশদিন। প্রাচীন রোমে হাট বসত আটদিন অন্তর। শেষ পর্যন্ত সাতদিনের গুচ্ছ ‘সপ্তাহ’ চালু করল ব্যবিলনের মানুষ। তার একটা কারণ যেমন চান্দ্রমাসকে চারভাগে ভাগ করে ফেলার পক্ষে ওই সাতদিনের গুচ্ছ সুবিধাজনক অন্য কারণ হয়তো প্রাচীন ব্যবিলনের মানুষ ৭ সংখ্যাটিকে পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করত। অনুমান করা হয় সেদিনের মনুষের জানা সাতটি গ্রহের সংখ্যাই সম্ভবত এই পবিত্র বিশ্বাসের ভিত্তি। সপ্তাহ বা প্রহরের ভাঙ্গাগড়ায় মানুষের ভূমিকা প্রধান। মাসের হিসাবে কিন্তু তা নয়। চাঁদের কলার হ্রাসবৃধ্বি লক্ষ্য করে মানুষ এই সংখ্যাটি জেনেছে। জেনেছে একটি অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যার মাঝখানে আছে সাড়ে উনত্রিশ দিনের ব্যবধান। প্রাচীনকালে মানুষ অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে সময়টা প্রায় মেলে মহিলাদের শারীরিক ঋতু চক্রের সঙ্গে। প্রকৃতির অঙ্ক অবশ্য আরও অনেক জটিল, সে জটিল রাশির খোঁজ পেয়েছে মানুষ অনেক অনেক পরে। জেনেছে চাঁদের এই কলাক্রমের জন্য সময় লাগে ২৯,৫৩০৫৯ দিন। জটিলতার রাশির খোঁজে গিয়ে অপাতত লাভ নেই। একদিকে প্রকৃতির রং রূপের পরিবর্তন, জীবজন্তর আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র লক্ষ্য করেছে মানুষ, অন্যদিকে তার আশ্চার্য মস্তিষ্ককে ব্যবহার করেছে এই বিচিত্র গণিতে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ যখন দূরদেশ থেকে উড়ে আসা সারসের ডাক শুনে ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া অথবা বীজ বপনের উপযোগী সময়কাল ঠিক করছে অথবা তাইওয়ানের কাছে রোটেল- টোব্যাগো দ্বীপের জেলেরা যখন সমুদ্রে উড়ুক্কা মাছের দেখা পেলে তবেই মাছ ধরার সয় হয়েছে বলে নৌকো নিয়ে বেরুচ্ছে। মাছের দেখা না পেলে ফিরে আসছে শুকনো মুখে। ঠিক তারই পাশাপাশি চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য খ্রিঃ পুঃ দু’হাজার সালে, বর্তমানে ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার অঞ্চলে প্রাচীন মানুষ তৈরী করেছে এক অকল্পনীয় স্থাপত্য। অনেকগুলো পাথর সাজিয়ে আশ্চার্য মানমন্দির ঝঃড়হব যবহমব. প্রাচীন ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জী হল মুলত মাসের যোগফল। কিছু ২৯ আর কিছু ৩০ দিনের মাস মিলিয়ে তৈরী হয়েছিল বছরের হিসাব। কিন্তু সমস্যা হয়েছে সেই মাস অনুযায়ী ঋতুকাল ঠিক করতে গিয়ে। কারণ, এরই মধ্যে মানুষ চাষাবাসের কাজ করতে গিয়ে ঋতুর গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে। সমস্যা হল ঋতুর পরিবর্তন সূর্যের উপর নির্ভর করে চাঁদের উপর নয় অন্যদিকে মাসের হিসাব হয় চাঁদের হ্রাসবৃধ্বির উপর সূর্যের চলাচল এখানে অচল। সূর্য আর চাঁদের মধ্যে এই সর্ম্পকে স্থাপনের অঙ্কই আজ পর্যন্ত সব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জীকার মূল উপজীব্য বিষয়। সুদূর ব্যবিলন সভ্যতার প্রারম্ভ থেকেই সাড়ে ২৯ দিনের মধ্যে নিবিড় সর্ম্পক পাতানোর জটিল অঙ্ক চলছে বিরামহীন।

নক্ষত্রের অবস্থান দেখে নক্ষত্র দিন মাস বা বছর নির্ধারণ করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মিলিয়ে দেখেছেন সৌর দিন মাস বছরের সঙ্গে চান্দ্রমাসের সঙ্গের। এই অঙ্কগুলো শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন যাবত। প্রাচীন মিসরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার। গণিতের প্রাধান্য দিয়েছেন সিরিয়াল বা লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থানকে। ব্যবিলন আর গ্রিসে যে সব প্রাজ্ঞ গণিতজ্ঞ এই কাজ করছিলেন

তাদের মধ্যে মেটন ক্লিওট্রাটাস ইওডক্সাস হিরারকাস ক্যালিপাস স্মরণীয়। সৌর বছর আর চান্দ্রমাসের সম্পর্ক স্থাপনের এই অঙ্কই জন্ম দিল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ এর। নামগোত্রহীন একটি বাড়তি দিনকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ কোথাও কোথাও উৎসবে রূপ নিল। পশ্চিমের কোনও কোনও দেশে একসময় ওই বিশেষ দিনে নাকি কুমারী মেয়েরা বেরত তাদের পছন্দমতো পাত্র শিকার করতে। কুমারী মেয়েরা অপেক্ষা করতো কবে আসবে স্বপ্নে সে দিন ২৯ ফেব্রুয়ারি।

ইহুদী বর্ষপঞ্জী চান্দ্র ও সৌর আবর্তন এই দুটিকে স্বীকার করে তৈরী। ইসলাম গ্রহন করেছে চান্দ্রের অবস্থানকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে। ৬২২ খ্রিঃ ১৬ জুলাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেদিন মক্কা থেকে মদিনায় আসেন সেই দিনটি হল হিজরী বর্ষপঞ্জীর প্রথম দিন। বঙ্গাব্দের শুরু ৫৯৩ খ্রিঃ সালে। এই দিন থেকেই হিসাব করা হয়। হিজরী সন চান্দ্রমাসের বাংলা সাল সৌরমাসে গোনা হয় বলে দুই অব্দের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে প্রায় ১৪ বছরের যদিও বাংলাসন শরু হয়েছে ২৯ বছর আগে। বছরের। কারণ চান্দ্র বছরের থেকে সৌর বছর মোটামুটি ১০ দিন ২১ ঘন্টা ৩০ মিনিট বেশী। খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে জুলিয়াস সীজারের আমন্ত্রণে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনিসক মিসরীয় ক্যালেন্ডারের আদলে ঋতুকাল অনুসানে তৈরী করেন সোয়া ৩৬৫ দিনের সৌরবর্ষ। তৈরী হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে চালু আছে বা ছিল অসংখ্য বর্ষপঞ্জী। তার বিবরণ এই স্বল্পপরিসরে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। চীনদেশে আবিস্কৃত হয়েছে প্রায় নির্ভুল এক বর্ষপঞ্জী । দক্ষিণ আমেরিকায় অতিকায় মনোলিথ বা পাথরে ৫২টি সৌববর্ষের বিশাল চক্রাকার গণিত উৎকীর্ণ মায়াআজটেক সভ্যতার প্রচলিত ক্যালেন্ডার পাওয়া গেছে যাতে রয়েছে আঠারো মাসে এক বছরের হিসাব। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই চান্দ্র ও সূর্যের গতিবিধিকে আশ্রয় করে তৈরী হয়েছে বহু বর্ষপঞ্জী শতাব্দ, হিজিরা, বিলায়েতী, মগী, বঙ্গাব্দ, ফসলী তুর্কি, চৈতন্য অব্দ, বিক্রম সমবেত ও আরও অনেক বর্ষপঞ্জী। প্রাচীন ভারতের তৈত্তিরীয় সংহিতার ৩৬০ দিনের সৌরবর্ষের উল্লেখ আছে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে বৃহস্পতি গ্রহ ও সূর্যের গতিপথকে সমন্বিত করে যে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছে সেটিই প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী জ্যোতির্বিদ্যার নমুনা। বৃহস্পতিগ্রহ প্রায় বারো বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে এক একটি রাশিতে তার প্রদক্ষিণের সময়কাল সূর্যের ১২টি রাশিতে প্রদক্ষিণ সময়ের প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদহণ এই দুই সময়কালকে সমন্বিত করেছেন তাদের গণিতে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হিসাব আমাদের প্রথাবিদ্ধ পঞ্জিকার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না, যতটা মেলে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাশ বা দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকার হিসাবের সঙ্গে কারণ মেঘনাদ সাহার সংশোধনী বাংলার প্রথাসিদ্ধ পঞ্জিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান পায়নি।

প্রস্তাবিত আধুনিক বর্ষপঞ্জি

একদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন রয়েছে তেমন অন্যদিকে রয়েছে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সুবিধা অসুবিধার ক্ষেত্র। যে কোনও প্রাচীনতম অথবা আধুনিকতম বর্ষপঞ্জিকা তৈরী করার ক্ষেত্রে এই দুই এর গুরুত্বই সমান সমান। তাই আগামী দিনের পৃথিবীতে যে দুটি নতুন প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে তার মধ্যে এটি হল International Fixed Calendar.অন্যটি World Calendar. প্রথমটির ক্ষেত্রে বছরকে ভাগ করা হয়েছে তেরোটি মাসে। প্রতি মাসে আঠাশ দিন। তেরো নম্বর মাসটিকে ঢোকানো হয়েছে জুন ও জুলাই মাসের মাঝখানে। নাম দেওয়া হয়েছে ঋড়ষ. ২৮ ডিসেম্বরের পর একটি নামগোত্রহীন দিন যোগ করে বছর শেষ হচ্ছে ৩৬৫ দিনে। অধিবর্ষ বা লিপইয়ারে ওইরকম আর একটি দিন যোগ হবে ২৮ জুনের পরে। প্রতিটি মাস শুরু হবে রোববার, শেষ হবে শনিবারে। সমালোচকরা বলেছেন বাণিজ্যিক বা অন্যান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ক্যালেন্ডারের অসুবিধা হল একে সমান চারভাগে ভাগ করা যাবে না। World Calendar এ অবশ্য সে অসুবিধা নেই। একানব্বই দিনের সমান চারটি ভাগের প্রত্যেকটিতে রয়েছে তিনটি করে মাস। প্রথম মাস ৩১ দিনের পরের দুটি ৩০ দিনের। ৩০ ডিসেম্বরের পর একটি নামগোত্রহীন দিন এবং অধিবর্ষে ওইরকম একটি দিন যোগ হবে ৩০ জুনের পর। এই হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারী এপ্রিল জুলাই আর অক্টোবরের পয়লা তারিখ হবে রোববার।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ১০ দিন বাদ দেওয়া হয়েছিল কেন ? বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

প্রাচীনকালে বর্ষ গণনার জন্য ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার এটার প্রচলন করেন। কিন্তু ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি XIII এক ডিক্রির মাধ্যমে সেই ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন। এতে আগের ক্যালেন্ডার থেকে ১০ দিন বাদ দেওয়ার মুল কারণটি ছিল লিপইয়ারের হিসাবে গন্ডগোল। যেহেতু ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টার কয়েক সেকেন্ড কম সময়ে পুরো এক বছর হয় তাই প্রতি চতুর্থ বছরকে বলা হয় লিপইয়ার এবং সে বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইহা আগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল এই হিসাবের একটু ভুল থেকে যায়। কারণ প্রতি চার বছরে লিপইয়ার ধরলে আবার কিছু সময় বাড়তি ধরা হয়ে যায়। এটা সংশোধনের জন্য আবার প্রতি ৪০০ বছরে তিনবার লিপইয়ার বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

যেহেতু আগে সেটা করা হয়নি তাই ১৫৮২ সালে প্রথমে একবারে ১০ দিন বাদ দিয়ে ক্যালেন্ডারের হিসাব ঠিক করা হয়। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি ১২৮ বছরে প্রায় একদিনের ঘাটতি পড়ে। এর সংশোধনের জন্য ধরে নেওয়া হয় যে ২১ মার্চ হলো এমন একটি তারিখ যখন উত্তর গোলার্ধে দিন ও রাত সমান (ভার্নাল ইকুইনক্স)। আর যেহেতু সেটা স্থির করা হয়েছিল ৩২৫ খ্রিষ্টব্দে সে জন্য হারানো দিনের সংখ্যা নিরূপনের জন্য হিসাবটি করা হয় এভাবে (১৫৮২-৩২৫) /১২৮=১০ দিন (প্রায়) এবং এটাই বাদ দিয়ে হিসাব ঠিক করা হয়। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসাবটি হলো যেসব সাল ৪ দিয়ে বিভাজ্য সেগুলো হবে লিপইয়ার কিন্তু ১০০ দিয়ে বিভাজ্য লিপইয়ার হবে না তবে ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হলে আবার লিপইয়ার হবে। যেমন

১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ সাল লিপইয়ার ছিল না কিন্তু ২০০০ সাল ছিল লিপইয়ার। তবে এই হিসাবের একটু ভুল থেকে যায়, সেটা সংশোধানের জন্য বলা হয় কোনো বছর যদি ৪০০০ দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সেটা লিপইয়ার হবে না।

এই শেষ হিসাবটা অবশ্য এখনো সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। শুরুতে অনেকেই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মেনে নিতে চায়নি। তারা বলত আমাদের ১০ দিন ফিরিয়ে দাও। জারের রাশিয়া সেসময় ওই ক্যালেন্ডার মেনে নেয়নি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর পুর্বের ক্যালেন্ডার থেকে ১১ দিন বাদ দিয়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সেখানে চালু করা হয়।

বর্ষপঞ্জী নিয়ে না বলা ইতিহাস

মহাশক্তিধর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ জয়, মানবসভ্যতার পত্তন কিংবা বিনাশের মধ্যেই শুধু ইতিহাস সৃষ্টি হয় না। কখনো কখনো খুব ছোট্ট, আপত নগণ্য ঘটনাই একসময় জন্ম দেয় বিরাট ইতিহাস। আর তাই ইতিহাসে এমন কিছু গল্প আছে যা জানা সহজ নয়। সেসব অজানা ইতিহাস আর তার নেপথ্যের গল্প নিয়ে আজকের না বলা ইতিহাস পৃথিবীতে বিদ্যমান। খ্রিষ্টীয় দিন লিপি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ১০টি দিন ১৫৮২ সালে ৫ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর তারিখ গুলো কোন পাত্তা নেই ইতিহাসের পাতায়।

খ্রিষ্টীয় সন থেকে হারিয়ে যাওয়া ১০টি দিন

১৫৮২ সাল ঘুম থেকে উঠে তারিখ মিলিয়ে দেখলেন, পাক্কা ১০ দিন পর ঘুম ভেঙ্গেছে আপনার! কেমন লাগবে তখন? ১৫৮২ সালে অক্টোবরে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতারই মুখোমুখি হয়েছিল লাখ লাখ ইউরোপবাসী, যাদের অনেকেই ভীষণ মুষড়ে পড়ে এ ঘটনায়। সমস্যার বীজটা রোপিত হয়েছিল ১৬২৮ বছর আগেই । খ্রিষ্টপুর্ব ৪৬ শতকে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রচলিত বর্ষপঞ্জির সংস্কার করে নতুন বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। এতেও থেকে যায় কিছু সুক্ষ্ম ভুল। সিজারের বর্ষপঞ্জির সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণের ব্যবধান ছিল ১১ মিনিট। ভুলের মাশুল দিতে প্রতি বছর ১১ মিনিট করে হারাতে হয় পৃথিবীকে। কালের আবর্তে এই সুক্ষ্ম ভুলটাই ১৬০০ বছর পর পরিণত হয় মহীরুহে। বসন্তকালে সুর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের নির্ধারিত সময়টা মার্চ থেকে স্থানান্তরিত হয় শীতকালে। কী ভয়ানক বিশৃঙ্খলা! সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি। সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে দক্ষ পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেন পোপ। ব্যাপক পরীক্ষা -নীরিক্ষা শেষে তার অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক একটি বর্ষপঞ্জি তৈরি ও চালুর সুপারিশ করেন। পোপ তাদের সুপারিশ গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য একটি আদেশ জারি করেন। সর্বকিছু নির্ধারিত ছকে ফিরিয়ে আনতে বর্ষপঞ্জি থেকে ১০দিন মুছে ফেলার প্রয়োজন পড়ে। সিদ্ধান্ত হয় ১০ দিন এগিয়ে নেওয়া হবে তারিখ। ফলে ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবর পশ্চিম ইউরোপের মানুষ ঘুমাতে গেল এবং পরদিন ঘুম থেকে উঠে অবাক বিস্ময়ে আবিস্কার করল, সেদিনের তারিখটা ৫ নয়, ১৫ অক্টোবর! এ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয় মানুষ। পোপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে রীতিমতো দাঙ্গা বেধে যায়। কারণ, তাদের ধারণা ছিল, বর্ষবঞ্জি থেকে নয়, বরং নিজেদের আয়ুস্কালেরই ১০-১০টা দিন কেড়ে নেওয়ার পায়তারা করছেন পোপ! অন্যদিকে গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তারিখ বদলে যাওয়ার এ তথ্য ঠিকমতো পোঁছায়নি।

অনেক রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন এই পরিবর্তন মেনে নেয়নি। ফলে তৈরি হয় বিভ্রান্তির ধুম্রজাল। কিন্তু এই বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে যুক্তির কাছে। অবশেষে একদিন সবাই মেনে নেয় তা। সর্বত্র চালু হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

বাংলা বর্ষপঞ্জী পহেলা বৈশাখ ও সাংস্কৃতির শাশ্বত ধারা ঃ

আর মাত্র হাতে গোনা কয়টিদিন পেরুলেই, লাল পাঁড়ের সাদা কোড়া তাঁতের শাড়িতে মেয়েরা সাজবে নিজস্ব ঢঙে। ছেলেরা বেগুনী অথবা উজ্জল অন্য কোন রঙের রঙীন পাঞ্জাবী কিংবা ফতুয়া পরে জমায়েত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অথবা গানের আসরে মাতোয়ারা হবে রবীন্দ্র, নজরুল, লালনের গান নিয়ে। কাউকে বলে দিতে হবে না আজ পহেলা বৈশাখ। সর্বত্র একটা সাজ সাজ রব, কিন্তু অনেকেই জানে না এই উৎসবের উৎস কোথায় কবে থেকে শুরু হয়েছে মাটির সানকিতে, মাটির পাত্রে রান্না করা পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ সাথে বেগুন ভাজি। ছায়ানট তিনযুগ আগে রমনা বটমুলে শুরু করেছিলো নববর্ষ উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠান। ১৪ এপ্রিল ১লা বৈশাখের প্রথম প্রহরে সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আবহমান বাংলার শাশ্বত এই অনুষ্ঠান। পাক শাসক চক্র পাকিস্তান নামক অদ্ভুত রাস্ট্রে বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি মনে করতো। মুর্খের দল জানতোনা বাংলা নববর্ষ শুরু করেছিলেন, আলাউদ্দীণ হোসেন শাহের পথ ধরে সম্রাট আকবর। পহেলা বৈশাখের সার্বজনীনতাকে একঘরে করে রাখার জোরালো প্রচেষ্টা করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং বাঙালী জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী নয় এমন একটি স্বার্থান্বেষী মহল। বর্তমান বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ধারাটি ছেষট্টি সালে সানজিদা খাতুনের নেতৃত্বে ঘনীভুত হয়ে একটি সর্বজন গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রুপ নেয়। ছায়নট কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি এখন সারা দেশময়। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাঙ্গালীরাও এই উৎসবে সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা একটু গভীরে প্রবেশ করে দেখব বাংলা সহ অন্যান্য দিন পঞ্জির শুরুর কথা।

যখন যাত্রা হলো শুরু (বর্তমান বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরুর কাহিনী)

দেড় হাজার বছর পুর্বের কথা, রাঢ়, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, গৌড় পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য ভাষা সংস্কৃতি এক অভিন্ন অথচ রাজ্য গুলো নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। গৌড় রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুর্বণে বাস করতো অসীম সাহসী ধীমান এক তরুন। তার সাহস আর মেধার তুলনা করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। সে ছিলো কিংবদন্তী তুল্য। এই যুবক আপন সাহস আর বীরত্বের কারণে একসময় পাঁচটি রাজ্যের রাজা হলেন। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে এই রাজ্য পাঁচটি নিয়ে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, রাজ্যটি তখন গৌড় নামে পরিচিত ছিলো। আজ থেকে এক সহস্র চারশত বার বছর আগের কথা অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিঃ সালে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক তাহার সিংহাসন আরোহনের দিন পুরানো শকাব্দ থেকে নতুন বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। অনেক ইতিহাস বিদ বলে থাকেন গৌড় এবং বঙ্গ দুটো পৃথক রাজ্য ছিলো। কৌনজের রাজপুত্র হর্ষবর্ধন ৬০৬ সালে বহু শাসন করেন এবং তিনি হর্ষাব্দ নামে একটি অব্দের সৃষ্টি করেন। যা হোক, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) ৯০৩ হিজরি সনে, বঙ্গাব্দকে নতুন মাত্রা দেন হিজরী চন্দ্রবর্ষকে সৌরবৎসর বঙ্গাব্দের সাথে সমন্বয় করে নতুন বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তখন বাংলাসন, গণনা অগ্রাহয়ন মাস থেকে শুরু হতো। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ১২ বৎসর বয়সে ১৫৫৬ খ্রিঃ সাল মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সনে দিলীর সিংহাসনে আরোহন করেন। ক্ষমতা গ্রহণের ২০ বৎসর পর ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই, রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন আফগান শাসক দাউদখান করবানীকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল ১৫৭৬ সালে অর্থাৎ ৯৮৩ হিজরী সনে বঙ্গাব্দকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে প্রচলিত বিভিন্ন বর্ষপঞ্জির সাথে সমন্বয় করে বৈশাখ মাসকে বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে ধরে নিয়ে চন্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন পুর্বক নতুন বাংলা সন শুরু করার জন্যে মোগল কর্মচারী আতাউল্লাহ্ খান ফায়েজীকে নির্দেশ প্রদান করেন। সেই থেকে বর্তমান বাংলা বর্ষপঞ্জির শুরু। বাংলা সালের যাত্রা শুরু ১৪১৩ বৎসর আগে। বর্তমান বাংলা নববর্ষের যাত্রা শুরু ৪৩০ বৎসর পুর্বে মাটিরপাত্রে রান্না করা ভাত মাটির সানকিতে ইলিশ মাছ আর বেগুন ভাজি সহযোগে একত্রে বসে খাওয়ার শুরু হয়েছে চলিশ বছর পুর্বে। অব্দের শুরু, উন্নয়ন, সংস্কার আর নববর্ষ বরণ উৎসব বিয়ষগুলো আজ একই গ্রন্থিতে গাথাঁ এখানেই বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য বর্ষপঞ্জি তথা জাতিসমুহের নববর্ষের সাথে বাঙালী জাতির নববর্ষের পার্থক্য।

আজই একই গ্রন্থিতে গাথাঁ বাংলার বিভিন্ন অংশ কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও একত্রিত, কখনও স্বাধীন, কখনও পরাধীন থেকেছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্গে অন্তর্ভূক্ত ১৩৬তম দেশ। এই স্বাধীন স্বদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পুর্বে।

বাংলার নববর্ষ উৎসব

পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ বাঙালী জাতির একটা সার্বজনীন জাতীয় উৎসব। উৎসবের দিনে আমরা নিজের আনন্দে বহুর সঙ্গে মিলিত হই। নববর্ষের বিশেষত্বকে আশ্রয় করে আমরা বিচিত্র সব উৎসবের আয়োজন করি। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় , জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের যোগ বেশি, সংকীর্ণ সীমা উত্তীর্ণ হয়ে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করছে নববর্ষ। নববর্ষ বর্তমানে একটি জাতীয় উৎসব। এ উৎসব জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর জাতীয় মহোৎসব। নতুন বিশেষ রঙের শাড়ি পাঞ্জাবী পরিহিত তরুন-তরুনীরা সারাটি দিন মাতিয়ে রাখে দারুন প্রাণময়তা দিয়ে। উৎসবের আমেজ বজায় থাকে রাত অবদি।

অখন্ড মহাকাল বয়ে চলেছে অনাদিকাল থেকে। এই অনাদিকালকেও মানুষ খন্ডিত করে পুনরায় আরম্ভের পক্ষপাতী। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা নববর্ষের ঘষামাজা হয়েছে বেশ কয়েকবার। পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই নিজস্ব অব্দ বা বর্ষ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব অব্দ হলো ‘বঙ্গাব্দ’ বা বাংলা সন। আমরা জেনেছি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বর্ষ আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অগ্রহায়ণ মাসের নাম ছিল মার্গশীর্ষ মাস। অশিক্ষিত জনসাধারণ তখনও চন্দ্রসুর্যের গতি দেখে বর্ষ গণনা করতে শিখেনি। তাই প্রাকৃতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখে তারা বর্ষ গণনা করতো। অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি বা ধান জন্মায় সে সময় সেটা অগ্রহায়ণ। রাজস্ব আদায় ও ঋণ পরিশোধের এটাই ছিল যথার্থ সময়। কারণ এ সময়ে কৃষকরা ফসল তুলতেন বাংলার খাজনা বাংলাতেই থাকতো তাই রাজার খাজনা অগ্রাহয়ন মাসেই জমা করা হতো । এটাকে ফসলী সালও বলা হতো। কিন্তু কালের গতি পরিবর্তনশীল । বাংলা যখন স্বাধীনতা হারালো, তখন অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হলো। বিশাল নক্ষত্রযুক্ত পুর্নিমার নাম বৈশাখী। যে মাসে এ বৈশাখী হয় তার নাম হয় বৈশাখ। বৈশাখ মাস ভিন্ন নামে ভারত বর্ষের অন্য অনেক বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস।

বাংলা সন প্রচলনের পিছনে দুজন মুসলমান সম্রাটের নাম জড়িত। ‘সন’ শব্দটি আরবী। সাধারণের ধারণা সে সময়ে প্রচলিত সৌর বৎসর ও আরব দেশের হিজরী সনের অর্থাৎ চান্দ্রবৎসরের সমন্বয়ে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের প্রচেষ্টায় বর্তমান বাংলা সন চালু হয়। হোসেন শাহের রাজত্ব আরম্ভ হয় ৯০৩ হিজরী অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক সে সময়ে অথবা এর কিছুকাল পরে বর্তমান বাংলা সনের সুচনা হয়। বর্তমান বাংলা নববর্ষের প্রবর্তক হিসেবে অনেকে সম্রাট আকবরের নাম উলেখ করেন। তাঁদের মতে, হিজরী সন থেকে দশদিন কম ধরে আকবরের রাজস্ব বিভাগের প্রধান মন্ত্রী টোডরমল, রাজকর্মচারী আতাউল্লাহ্ খান ফায়েজীকে দিয়ে নববর্ষের সুচনা করেন। বাঙালী জাতিসত্তার গোড়াপত্তন ঘটে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে। পরবর্তীকালে বাংলার মুসলমান শাসকদের আমলে বাঙালীদের ভাব ও সাংস্কৃতিক সুদৃঢ় ভিত্তি

স্থাপিত হয়। আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন বাংলা ৯৬৩ সনে। তখন ৯৪৫ বাংলা সনের লিখিত হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছিল। আকবরের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা সন প্রচলিত ছিল। হিসাব করে দেখা গেছে ৯১০ হিজরী সনের সঙ্গে বাংলা সনের মিল হয়। গণনায় গড়পড়তা ৫/৬ দিন বেড়ে যায় বলে ৯০৩ হিজরী সনে বাংলা সনের আরম্ভ ধরতে হয়। তাই প্রচলিত মত হলো সুলতান হোসেন শাহ্ই বর্তমানে বাংলা সনের স্রষ্টা। বাংলা সন সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রথম প্রচলিত হলেও আকবরের আমলেই এটা একটা সর্বভারতীয় সনসমুহের অন্যতম সন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলা নববর্ষ। বাঙালীর জীবনের নবচেতনার আলোকে নতুন জীবনের অবগাহনের দিন। আবহমানকাল ধরে এ দিন বাঙালীর জীবনে নতুন সম্ভাবনার উৎসবের দীপালী জ্বালিয়ে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। পহেলা বৈশাখের সঙ্গে মুছে যায় যত সব জীর্ণ পুরাতন। চিরনতুনকে বরণ করে নেয়ার আর্তি আকুল হয়ে ওঠে। পহেলা বৈশাখ তাই বাঙালী জীবনে নবউন্মেষের দিন অতীতকে মুছে ফেলার দিন। বিগত বছরের সকল দুঃখবেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ, আর গান দিয়ে ঢেকে দেয়ার দিন। পহেলা বৈশাখ উৎসবের দিন। নবতরঙ্গে মঙ্গলের ঘন্টাধ্বনি প্রত্যন্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে দেবার দিন। ৫৯৩ খ্রিষ্টীয় সালে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক যে অব্দের শুরু করেছিলেন সৌরবর্ষ হিসেবে, ১৪৯৮ খ্রীয় সালে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ তাকে চন্দ্র বর্ষের সাথে সমন্বয় করেন। ১৫৭৬ সনে অর্থাৎ মাত্র ৩৮ বৎসর পরে সম্রাট আকবর সনটিকে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে রাজকীয় বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তর করেন। এই হাল আমলে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাসনকে এক বছর পিছিয়ে দেন। অন্য বাঙালীদের যখন বিদায়ী বর্ষের শেষ দিনে অবস্থান করবেন তখন বাংলাদেশের বাঙালীরা নববর্ষ উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকবে।

যদিও বছরের প্রথম দিনটি প্রতিদিনের মতই একটি দিন। কিন্তু তবু কোথায় যেন এর মধ্যে একটা অপূর্বতা রয়েছে। মানুষ অতীত বছরের ব্যর্থতা ও গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুন বছরে আরও ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে চায়। তাই প্রতিটি বাঙালী এই দিনটিকে উৎসবমুখর করে তোলে। সরল বাঙালীরা বিশ্বাস করে বছরের প্রথম দিনটি যেমন যাবে সারা বছরই তেমন যাবে। তাই এই দিনে মানুষ ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ব্যবহার করে। আনন্দে কাটায় দিনটি প্রার্থনা করে যেন গোটা বছরটাই যেন আনন্দে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পহেলা বৈশাখ বিভিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পলী অঞ্চলে নববর্ষের শুরুতে মেলা বসে। শিশুরা খেলনা কিনে আনে, নাগরদোলায় দোলে, বিচিত্র আনন্দানুষ্ঠানে যেতে ওঠে। বড়োরা সম্বৎসরের জন্য মাটির বাসন, নানারকমের রবিশস্য, বেতের বাঁশের ডালা-কূলা, লোহার ও কাঠের নানা ব্যবহার্য উপকরণ কিনে রাখে।

পহেলা বৈশাখে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে 'হালখাতা' উৎসব। বিচিত্র সুন্দর উপকরণে দোকানঘর সাজিয়ে 'হালখাতা মহরৎ করা হয়। জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। নববর্ষের পুন্যদিনে গৃহস্থরাও বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। কোথাও কোথাও হাল-চালনা উৎসব হয় এ দিনেই। নববর্ষের দিন চট্টগ্রাম জেলায় 'আমানী' খাওয়া, বলীখেলা, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় গরুরদৌড়, রাজশাহী ও মালদহতে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং সারা বৈশাখ মাস ধরেই চলতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানটি বাঙালীর একটি জাতীয় উৎসব। শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর এতে সমান অধিকার। এটা শংকর-বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে একটা প্রণীধানযোগ্য বাংলাদেশ তথা বঙ্গোপসাগর থেকে হিমালয় অব্দি বিশাল বদ্বীপের লিখিত ইতিহাস খুব পুরানো নয়। ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে এই ভুভাগের প্রকৃত ইতিহাস খুব পুরানো নয়। ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে এই ভুভাগের প্রকৃত ইতিহাস অনুমান নির্ভর। গ্রীকরা সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলো। বাংলার ইতিহাসের সন তারিখ এক ইতিহাসবিদের সাথে অন্য ইতিহাসবিদের সাথে মেলে না। তুর্কীদের আগমনের পূর্বে জ্যোতির্বিদ্যা বর্ষপঞ্জি ঠিকুজি সম্পর্কে পন্ডিতরা চুলচেরা চর্চা করলেও তখন তিথিবারে সবার দৃষ্টি ছিলো নিবদ্ধ। সঠিক সন তারিখ নির্ধারণে পন্ডিতদের কোন উৎসাহ ছিলো না। কৃত্তিবাস আদিত্যবার। শ্রী পঞ্চমী পুন্য মাঘ মাসে জন্মে ছিলেন- নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ নেই । সঠিক জন্ম তারিখ বের করা কষ্ট করা সন আরবী শব্দ এর বহুবচন তাওয়ারিখ অর্থাৎ ইতিহাস। তাই দেখা যায় আরব দেশীয় শাসক বা মুসলিম শাসকরা বাংলা শাসন করার সময়ই বিজ্ঞান ভিত্তিক অব্দের প্রচলন হয়েছে। ৫৯৩ সালে প্রবর্তিত বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ) ১৫৭৬ সালে এসে বঙ্গাসন হয়েছে। ২০০৬ সনে বাংলা নববর্ষ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ। নববর্ষ সবার জন্যে শুভ হোক।

বর্ষবরণ

এ.এফ.এম ফতেউল বারী রাজা

প্রাতে রক্তিম সুর্যোদয়ের সোনালী রশ্মির ছটা পূর্বে দিগন্তের তিমিরে জেগে ওঠার সাথে সাথে এদেশের আদি আধিবাসী এবং বাঙ্গালীদের 'শুভ নববর্ষ' সম্ভাষণ আর কোলাকুলি দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষের জন্ম মুহূর্ত পহেলা বৈশাখের।

চারশত বছর পুর্বে মুঘন সম্রাট মহামতি আকবর ফসল তোলার সময় খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে হিজরী সনের সঙ্গে মিল রেখে বঙ্গাব্দ গণনার রীতি প্রচলন করেছিলেন যা কাল পরিক্রমায় জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাঙ্গালীর প্রাণের হিল্লোল এবং অনাবিল আনন্দে অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন মহামিলনের মহোৎসবে পরিণত হয়েছে পহেলা বৈশাখ। যে উৎসবের জোয়ারের সাদর সম্ভাষণ জানাতে মেতে উঠে বাঙ্গালীর প্রাণ। ছন্দে ছন্দে কত আনন্দে কবি গুরুর গানে গানে,

''এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমুর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দুর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি
অশ্রুবাষ্প সুদুরে মিলাক।।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা।''

আমাদের বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকায় ১৯৬৭ সালে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে সোহ্রাওয়ার্দী (রমনা) উদ্যানে পাকুর বৃক্ষতলে শতায়ু প্রাঙ্গাণে ছায়ানটের প্রভাতী গানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিলো বর্ষবরণ উৎসব। মাত্র সাড়ে ছয়শত গন্ডিবদ্ধ শ্রোতামন্ডলীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত নিরাভরণ পরিবেশে এ উৎসবের যাত্রা শুরু হলেও মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য পরিস্থিতির কারণ ব্যতীত কখনও এ অনুষ্ঠান বন্ধ থাকেনি। তবে ১৪০৮ বঙ্গাব্দে অপশক্তির অশুভ কালো হস্তের বোমা হামলায় তাৎক্ষণিক দশ জনের অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এর পরের বছরও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থেমে থাকেনি। অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয়েছিল চারুকলার মঙ্গাল শোভা যাত্রা। যাতে শোভা পেয়েছিল বিরাটকায় পাখি, ঘোড়া, বাঘ, হাতী, ড্রাগন সহ বিভিন্ন মুখোশ। গেল ২০০২ ইং সালে ইঙ্গ-মার্কিনদের ইরাকের উপর নির্লজ্জ বর্বরোচিত ঘৃণ্য হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে অনুষ্ঠানে গান প্রধান্য পেয়েছে।

আগ্রাসন এবং হামলার বিরুদ্ধে মঙ্গাল শোভাযাত্রায় নরখাদক বুশ এবং তার পদলোহী কুত্তা ব্লেয়ারের উপর ব্যঙ্গাত্বক চিত্রে বিভিন্ন পোষ্টার ফেস্টুন সঙ্গাত কারণেই স্থান পেয়েছিল। যা চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলা থেকে দোয়েল চত্বর, মৎস ভবন ও শিশু পার্ক প্রদিক্ষণ হয়ে পুনরায় বকুলতলায় এসে শেষ হয়েছিল। জানা যায়, মঙ্গাল শোভাযাত্রার আয়োজক ছাত্র-শিক্ষকরা ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে মাটির টেপা পুতুল সহ আমেরিকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের প্রতীক ''স্ট্যাচু অব লিবার্টি'' জাতীয় মনুমেন্টের বিশালাকায় দানবাকৃত এক ব্যঙ্গাত্বক প্রতিমুর্তি প্রদর্শন করেছেন। মুর্তির গা জড়ানো ছিলো কুৎসিত কালো আবরণে, নীচে লেখা ছিলো 'সাম্রাজ্যবাদী ন্যায় বিচার'' এক হাতে ছিল মশালের পরিবর্তে বিচারের প্রতীক নিক্তি। নিক্তির ডান পাল্লায় প্রতীকি বিশ্ব, বাম পাল্লায় টাকা- পয়সা।

পৃথিবীর চেয়েও টাকার ওজন বেশী দেখানো হয়েছে। অন্য হাতে পুস্তকের পরিবর্তে তুলে দেয়া হয়েছিল হামলাকারী সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক যুদ্ধ বিমান। এই বিশালাকার মুর্তিটি শোভাযাত্রায় বহন না করে সাহাবাগের মোড়ে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। যাতে করে ঐ মূর্তির কুৎসিত কালিমায় জড়ানো রুপ নববর্ষের আনন্দঘন পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য হলেও বিষাদগ্রস্ত করে এবং মার্কিনীদের প্রতি অনন্ত ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। এ বছর মঙ্গাল শোভাযাত্রায় আমাদের দেশে সন্ত্রাস ও বোমা হামলায় নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিবাদের বিভিন্ন চিত্র, পোস্টার ও ফেস্টুন থাকবে বলে আশা করি। তাছাড়া ইসলামী লেবাসে বৃহদাকায় দানব সদৃশ নরখাদকের মুর্তি স্থান পেতে পারে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান প্রতি বছর ন্যায় এবারও পাকুর বৃক্ষতলে তথা রমানার বটমুলে শতায়ু অঙ্গান থেকে অস্থাচল সহ পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে। ছায়ানটের তরুণী শিল্পীরা আসবে মুখে আলপনা, কপালে টিপ, কাঁকন, বেলী ও গাঁদা ফুলের অলংকারে সজ্জিত হয়ে, লাল পাড়ের বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পড়ে। সেই সংগে তরুণ শিল্পীরাও সমবেত হবে ঐতিহ্যবাহী পাজামা, পাঞ্জাবী পড়ে। নানা বর্ণের নানা পোষাকে শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা ও তার সংগে অজস্র মানুষ যোগ দেবে সেই সাথে।

ভোর ছয়টায় শুরু হবে সমবেত তবলার বাদন একটানা ১৫ মিনিট। এরপর একসংগে আরও ১৫ মিনিট চলবে বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের সুর। উৎসবের জোয়ারে এভাবে গা ভাসিয়ে চৈত্র শেষে শুকনো পাতার মতো বিগত দিন গুলোর সব ব্যার্থতা, সব ব্যথা, সব গ্লানী ঝেড়ে ফেলে, ধুয়ে মুছে বৈশাখকে বরণ করা হবে নতুন স্বপ্ন আশা নিয়ে। উদ্যানের ভিতরে খুব ভোরে থেকেই অপ্যায়িত করা হয় নানা ধরনের দেশী খাবারের মাধ্যমে। এসময় চলবে মাটির সানকিতে পান্তাভাত, ইলিশ ভাজা, চ্যাপা শুটকি, টাকি মাছের ভর্তা, বেগুন ভর্তা, আলু ভর্তা, ডাল ভর্তা, সরিষা ভর্তা, কাঁচালংকা, শুকনো পোড়া মরিচ খাওয়ার

এক মহা প্রতিযোগীতা। যে কখনোও পান্তা ভাত খাননি, সেও এই দিনটিতে এহেন ললুপ রসনার সাধ গ্রহণে সামিল হতে ভুল করবেন না।তাছাড়া দেশী চিতই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, ছাউন্না পিঠা, নারিকেলের সন্দেশ, চিড়ার লাড্ডু, মুড়ির মোয়া, মন্ঠা মিঠাই, হাওয়াই মিঠাই, মুড়ি মুড়কি, তিলের খাজা, বাতাসা, কদমা, মিহি দানা, চানাচুর, বুট, চিনা বাদাম ইত্যাদির পসরা বসবে। উদ্যানের মুল ফটকের পাশেই বসে এই মেলা। ৬.৩০ মিঃ থেকে ২ ঘন্টাব্যাপী শুরু হবে ছায়ানটের শিল্পীদের কন্ঠে প্রভাতী অনুষ্ঠানে দেশের গান। বাঙ্গালীর সাথে বাংলা গানের পরিচয় হবে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যেমন

''উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই''। আবার
''দুর্গম গিরী কান্তার মরু দুস্তর পারাবার ওহে
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুশিঁয়ার''।

যার শেষ হবে রণ ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে। এরপর চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বের হবে মঙ্গাল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শেষে চারুকলার বকুলতলায় বসবে ঋষিজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খ্যাতনামা বাউল শিল্পীরাও গান করবেন। তাছাড়া তরুণ তরুণীরা হাত তালি আর তুড়ি দিয়ে নেচে নেচে গাইবে গান। যেমন -
''সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী''

তাদের মুখে আঁকা থাকবে নানা রংয়ের উলকি। চারুকলার ছেলে মেয়েরা সেদিন বহিরাগতেদের মুখেও উলকি এঁকে দেবেন। বাংলা একাডেমী ও নজরুল একাডেমী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসুচির মাধ্যমে দিনটি মহা আরম্বে পালন করবে। আমাদের চাঁদপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোও বর্ষবরণ মহাসমারোহে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করে থাকে। তবে জানা গেছে চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সংগীত নিকেতন ছায়া নটের ভাবধারায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করবে। নববর্ষের শুভাগমনের প্রারম্ভে সংগঠনের শিল্পীরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রের বিশেষ স্থানে আলপনা আঁকবে। সকাল ৬টা থেকে শিল্পকলা মঞ্চে ছায়ানটের কায়দায় মুল অনুষ্ঠান শুরু হবে। ৬টা ৩০ মিনিটের সময় প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরুহবে সংগীত পরিবেশনা। সংগীতানুষ্ঠান শেষে শিল্প কলা ভবন প্রঙ্গাণ থেকে বেরুবে মঙ্গাল শোভা যাত্রা। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর শিল্প কলা ভবন প্রাঙ্গানে এসে এর সমাপ্তি হবে। তারপর সবাই মিষ্টি মুখ করবে। এরপর থাকবে চিত্র প্রদর্শনী এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা। বিকেল ৩টা থেকে শুরু হবে আবৃতি এবং আলোচনা। আলোচনা শেষে হবে পুরস্কার বিতরণ। তারপর নৃত্যানুষ্ঠান, যন্ত্র সংগীত এবং সংগীতানুষ্ঠান। যা মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে।
বর্ষবরণের হৃদয় উজাড় করা প্রাণ মাতানো অনন্য আয়োজন বৈশাখী মেলা। যা সকাল থেকে জমে উঠে এবং সন্ধ্যা নাগাদ চলে। এই মেলা কোথাও একদিন, তিনদিন, একসপ্তাহ, পনের দিন এমনকি মাসাবধিও চলে। গ্রাম-গঞ্জ-শহর দেশের সর্বত্র হয়ে থাকে এই মেলা। দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হস্ত শিল্পীদের সু-নিপুন হস্তের শিল্প নৈপুণ্যে মনোরম শিল্পকর্ম বা দ্রব্য সামগ্রীর মহাসমারোহ ঘটে এই মেলায়। যেমন - বিভিন্ন প্রকার মাটির, কাঁঠের, সোলার পুতুল, জীব-জানোয়ার, কতরকম তালের পাখা, বাঁশের বাঁশি, পাটজাত দ্রব্য, সোলা কাগজ এবং কাপড়ের তৈরী নানা রঙ্গের ফুল, বিচিত্র ধরনের খেলনা, ছোট ছোট, খেলার হাড়ি-পাতিল, আসবাবপত্র, মাটির বিবিধ মৌসুমী ফল, পয়সা রাখার সাজ করা মাটির ব্যাঙ্ক, লক্ষীর সরা, ঢোলক, ডুগডুগি,অদ্ভুত সকল প্রাণীর মুখোশ ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়া মেলায় বিভিন্ন প্রকার কাঁচের চুড়ি, ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ার শাড়ি যে কোন মানুষের চোখ ধাঁদিয়ে তুলবে। তাই এগুলো মেলার দৃষ্টিকাড়া, চিত্ত হরনকারী, মনলোভা বস্তু বা মুল বিক্রয় পণ্য। তাই বৈশাখী মেলা দেশজ কৃষ্টি হিসাবে গণ্য হতে বাধ্য। পুতুল নাচ, বানর নাচ, সাপের খেলা, মোরগের লড়াই, বলির খেলা, নাগর দোলা বা রাধা চক্কর মেলাকে সার্বক্ষণিক মাতিয়ে রাখে।

পহেলা বৈশাখ চাষীদের বীজ বপনের পস্তুতির দিন। শুভ হালখাতা অনুষ্ঠান উদযাপনের দিন। বিগত দিনের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ পূর্বক নুতন ঋণ গ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করার দিন। ঘর ধুয়ে মুছে সাজিয়ে হালখাতার ঐতিহ্য স্বরূপ মিষ্টি মুখ করে এক উৎসবের আমেজ তৈরী করার দিন। ঋণ গ্রহীতাকে আমন্ত্রন জানানোর দিন। নববর্ষের কার্ড পাঠিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে শুভ কামনা, ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা জানানো বা আদান প্রদানের দিন। তাই

পহেলা বৈশাখ তথা ১৪১৩ বঙ্গাব্দে -

নববর্ষের আর্শীবাদ

আজি আর্শীবাদ নববর্ষের
প্রথম প্রহরের শুভক্ষণে
শান্তির অমীয়ধারা বহুক
অনন্তকাল ধরে সকলের
প্রাণ বৃক্ষের হৃদয় মুলে।
প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্ল মনে
আনন্দদোলায় দোল খাক
সুখানুভুতিতে অবিভুত হয়ে।

কবিতাঞ্জন.....

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর একগুচ্ছ কবিতা

নারী শ্রমিকের মৃত্যু, নগরের মেয়র ও সুশীল সমাজ

এখন রাত আট কি সাড়ে আট বোঝার ওপায় নেই, ল্যামপোস্ট গুলো বাতি বিহীন
চারদিকে ঘুট ঘুটে আঁধার রাস্তা সমেত পুরো নগরীতে বিদ্যুৎ নেই আালোহীন
অসংখ্য   খানা খন্দক আর গর্তে ভরা অমসৃণ রাস্তাঘাট সকল সরণী
ম্যানহোল গুলোর মুখ ঢাকনা বিহীন হা-করে আছে হাঙ্গারের মতো।
হটাৎ একটা শব্দ ঝপাৎ একটি আর্তনাদ ক্ষীন নিঃশব্দ রাতে হঠাৎই কাঁপুনি
দপ্তর ফেরত কর্মজীব একটি মেয়ে সময়ের তাড়া খেয়ে দ্রুত হাঁটছিল
হাঁটা যতো দ্রুত হচ্ছিল মেয়েটির আয়ু ততই ফুরিয়ে আসছিলো তার
গত রাতে ছোট বোনের আদুরে গলায় আবদার কানে বাজছিলো বারবার
বলে ছিল আপু আজ আমার জন্ম দিন, তাড়াতাড়ি এসো, নিয়ে সুন্দর উপহার
ফাঁকা রাস্তায় হটাৎ কোলা হল সবাই বলছে খোলা ম্যানহোল দায়ী মেহর
একদিন পর সমাজ কর্মী, সহকর্মীরা স্মরণ সভার আয়োজন করলো মেয়েটির
অনেক আলোচক বিজ্ঞজন বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান আলোচক নগরপিতা মেয়র
বিদ্রুপ, সমালোচনার পর ‘আমাকে ফাঁসী’ দেওয়া হোক বললেন শক্তিমান মেয়র
নগরের শক্তিহীন নাগরিকের দল ঘটনার প্রতীকি প্রতিদিন বিচার সভা বসালো।
সাক্ষী হলো মাতাল ধর্ষক দাঙ্গাবাজ চাঁদাবাজ ক্যাডার আর মেয়রের লাঠিয়াল দল,
অনেক যুক্তিতর্কের পর রায় ঘোষিত হলো মেয়েটি ছিলো দারুন অসর্তক ও চঞ্চল
শক্তিহীন ক্ষুব্ধ নাগরিক বৃন্দ, সুশীল সমাজ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করলো
সকাল থেকে শিল্পকারখানার বিষণ্ন সুন্দরীরা আদিষ্ট হয়ে অনশনে নিযুক্ত হলো
আবেগের শীৎকারে নড়ে উঠলো মেয়রের অতি শক্তি ধর চেয়ার শক্তির উৎসস্থল।
লুপ্ত হলো গোধুলীর রঙ, সন্ধ্যার আঁধারে পরিকল্পিত হামলা হলো অনশন স্থলে
অতিশয় তৎপর এখন মেয়রের রাজনৈতিক ঠিকাদার চাটার দল শক্তিমান ক্যাডার
রাতের আঁধারে লুণ্ঠিত হলো দুর্বল শীণর্কায় নারী শ্রমিকের অভুক্ত শরীর
চারপাশে আনন্দ ধ্বনি নয় শীৎকার নয়, ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দ মৃত্যু গোঙ্গানীর
নির্মমভাবে দলিত হলো সকালে দেয়া নাগরিকেদের পবিত্র ফুলের পাপড়ি
খুনী ক্যাাডাররা নির্মমভাবে কেড়ে নিল প্রতিবাদী নারী শ্রমিকের সম্ভ্রম আব্রু
লজ্জায় মুখ নত করলো ঢাকনি বিহীন ম্যানহোল, খুবই খারাপ লাগলো তার
ধুয়ে মুছে গেলো রোদেলা দুপুরে নেতাদের আশ্বাস আর সোহাগের মেকি স্বর
মেয়র ধন্য হলো অবসর নিলো সুশীল নাগরিক সমাজের আলোচনারা আসর

(২)
নারী ও বিরুদ্ধ সময়

আকাশ বাতাস ভীষণ মথিত, চৌদিকে রাণী বর্ণালীর ক্রন্দনের শব্দ
কান্না ঠেকানোর সাধ্য নেই আমাদের তবুও দেশে করতে হবে আজ প্রতিবাদ
গ্রামগঞ্জ শহর বন্দর দখল করে নিয়েছে ক্যাডাররা,ওরা নয়াবগীর দল
বর্ণালীর মেধা আছে, নেই নিরাপত্তা তাই আজ ঘরে বন্দিও, দুয়ারে অর্গল
রাণী দপ্তরে যেতে পারে না রাস্তায় বখাটেদের উৎপাত সর্বত্র সন্ত্রাসীদল
ক্যাডার আর সন্ত্রাসী ওদের অবাধ গতি , হানা দিচ্ছে ওরা বিচারলয় অব্দি
কুলাউতির মেয়ে শিবানীপাত্র, সেবিকা ফ্যাশান পার্লারের ওখানেও ভয়
আজ বাইরে যাওয়া বন্ধ, রাস্তায় সশস্ত্র ক্যাডার জীবনে দারুন সংশ'য়
রুটি রুজি বন্ধ, শস্য দানার অনটন অগ্নি বিহীন চুলা ঘরে, আজ বিরুদ্ধ সময়
কোথায় যাবে বর্ণালী, কোথায় যাবে রাণী, অথবা শিবানী কোন কাদা জলে
বিরুদ্ধ সময়ে উত্তর চাই আমাদের নব প্রজন্ম, এরা আছে কোন জঞ্জালে
মহা বিস্ফোরণ চাই, নতুন অক্সিজেন চাই, এই কৃষ্ণ পক্ষ দুর করতে হবে।
নারীরা কি আজ কথা বলবেন? ওরা কি বের হবে না ঘরে বাইরে
বিরুদ্ধ সময়ে পাহাড়িপল্লীতে বৌদের হাট বাজারে নেই ঝাঁকা মাথায় রাণী
বাঁধা কপি, সিম, শশা সবজীর ডালা সাজিয়ে নেই নরেনের বউ শেফালী
রাস্তার ধারে মুদী দোকানে পশরা নিয়ে নেই শোভা সেও আজ ভীষণ ভীত
ওরা কেউ এখন সাজায় না দোকানে বিক্রির চাল, ডাল, তেল, নুন আর আদা
চাই স্বপ্নময় স্বদেশ যেখানে তারুণ্য থাকবে, থাকবে না সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ
যাত্রা শুরু করো যদিও গন্তব্য অজানা, ছড়াও রমিজার নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ
আর দুঃস্বপ্ন নয় শুরু হোক সত্য ভাষণ, সত্য উচ্চারণ হোক প্রচন্ড প্রতিবাদ
বিরুদ্ধ সময়ে নবপ্রজন্মের সাহসী রাম রহমান রাসেল গড়ে তোল প্রতিরোধ
অনুপ্রেরণা হোক সমুদ্র সৈকতে বালু চরে শিশুদের মহড়া বিহীন নাটকের অভিনয়
দৃষ্টান্ত হোক, শামুক, ঝিনুক কুড়ানো কর্মজীবি শিশুদের শ্রম, এই বিরুদ্ধ সময়

(৩)
নারী ও প্রত্যাশা পুরুষের

মানবিক গুনে গুনান্বিত হতে হবে থাকবে না কোন ত্রুটি কারণ তুমি নারী
কেবলই বিলাবে সুখ থাকবেনা আত্মমর্যাদা বোধ কিংবা জীবনের দাবী
এ প্রত্যাশা কারো একার নয় সকল পুরুষের কারণ তারা যে সমাজপতি
জীবন অটুট থাকুক বা না থাকুক শুধুই আপোষ করবে তুমি রমনী
নিজের মতো করে বাঁচতে শেখা এ কোন আজব কথা, এ কার ধ্বনি
তুমি বারবেলার ঘাট, শুদ্ধ-অশুদ্ধ স্নান শেষে শুয়ে থাকবে পুরুষের পায়ে
অনন্ত সুজন কেউ নেই তোমার, ফেরার পথে কেউ তাই বাজাবেনা বীণ
শীতলতা খুঁজতে আসবে রোদেলা দুপুরে অথবা বিরহী বিকেলে, তপ্ত শরীরে
কাজল পুকুরে কিশোরী যখন ছফাৎ ছফাৎ আওয়াজ তুলবে রোদেল দুপার
ঘাটের কিনারে বসা কিশোরী, ক্ষণকাল আগে বন্দি ছিলো অরন্য প্রভাতে
নৈসর্গের মুগ্ধতায় অচেনা পুরুষ নিহিত সুর্যের স্বাক্ষিতে
বিমুগ্ধ কিশোরী স্বর্গীয় সুখে, পুলকিত সকল কিছু ভুলে অচেনা শিহরণে
দারুন প্রীতিতে সকল বায়না ভুলে নিভৃত দুপুরে কিশোরী অন্যতে মিশে
আনন্দ শেষে শরীর জুড়ালে, মরু মাঠে সকল ক্রন্দন পুরুষ উপেক্ষা করে
পুরুষের প্রত্যাশা পুরণ শেষে কিশোরী তখন নারী ঘরে ফিরে একা সুখী অন্ধকারে
পথে পথে ও ভাবে, অচেনা আনন্দ কিংবা সৌরভে মুখ ছিলো দুপুরে।
বাহ কী চমৎকার ছিলো পুরুষটি-অনিন্দ্য সুন্দর, মনে পড়ে ভালোবাসার মুহুর্তেটিরে
স্বপ্নকাতর রাত পেরিয়ে ভোর, হঠাৎ দুপুর, ফাঁকা ঘাটে নেই সে পুরুষ
একাকী বিপন্ন নারী ঘরে ফিরে চার পাশে কেউ নেই অভিলাষ

(৪)
অসহায় নারী শ্রমিক ও একটি চাকুরি

ভীষণ ক্লান্তিতে মায়ের কোলে মাথা গুজলো শ্রান্ত এক নারী শ্রমিক
মা বললেন, সোনা কেন এত পরিশ্রম করিস, কষ্ট তোর অনেক
মুখে একটা কঠিন রেখা ফুটেছিল, বিরত করল মার তপ্ত শ্বাস
নারী শ্রমিকটি ভাবলো বিক্রি হয়েছে ওর ঘামে ভেজা প্রতিটি দিবস
মা বললো কষ্টকর চাকুরীটা ছেড়ে দে সোনা, আমি যে সইতে পারি না
রাত্রে পুরষ বন্ধু বলল চাকুরী হারালে জীবনের চাকাতো চলবে না
আজ খুব সকালে ওঠে ভাবল নারী শ্রমিক, কারখানায় আর যাবে না
যা হোক কপালে, এই চাকুরী ছেড়েই দেখি, জীবন একরূপ চলবেই
ধুত্তোর নিকুচি করছি এ চাকুরীর আজই ছাড়ছি কেমন হয় দেখি
পদত্যাগ করতে না করতে বহুজন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় চায় শ্রমিকটিরে
ধর ধর মারমার রব তুলে হাতিয়ে নিলো চাকুরীটি সুন্দরী একজন
মস্ত একটা জাল চোখের পলক ফেলার আগেই বিছিয়ে ফেলল সেজন
সুযোগটাকে কিছুইতেই অবজ্ঞা করলো না তারই মত আরেকজন
তরিৎ এগিয়ে এসে দ্রুত লুফে নিলো চাকুরীটি প্রয়োজন ছিলো অন্তহীন
দিগ্বিজয়ীর হাসি হেসে ইপ্সিত চাকুরীতে যোগ দিলো আনকোরা মেয়েটি
চাকুরী ছাড়া মায়ের কোলে সময় কাটে না, খাবার মিলে না, তীব্র ক্ষুদার জ্বালা
অবসর রূপান্তরিত হলো ক্ষুধায়, বেকার শ্রমিক নারীর চারদিকে ভীষণ ঝামেলা
অসহায় নারী শ্রমিক এক সময় ছুটতে ছুটতে কষ্ট কর কর্মস্থলে ফিরে এলো
হাঁফাতে হাঁফাতে বলল চাকুরী ছাড়া এখন যে বেঁচে থাকা দায়
তাই আজ বাঞ্চনা তার চাকুরী নামক সে চকচকে সোনার গোল্লাটা
কাতর কন্যাভাবে ফের কেউ যদি বসিয়ে দিত তার শূন্য করতলে গোল্লাটা
আমি, আমার মা, পুরো পরিবার আটকিয়ে আছি অসহ্য ক্ষুধার জালে
মা বলল সোনা ফের ধর চাকুরীটা, জীবন জড়িয়ে আছে ক্ষুধার অনলে

(৫)
নারী ও ভালোবাসা

শোন মানুষ, ভৌতিক দৃশ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমি এক স্বস্তিকামী নারী
নিষ্ঠুর দৌবারিক, তার বন্ধ জানালায় টোকা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত আমি
নষ্ট নীড়ে ধূর্ত হে নর আমি ভয়ার্ত সেই ক্লান্ত পাখি আজ বিপদগামী
নিঃসঙ্গা অবরোধ শেষে বিদায় নেওয়া এই বিহঙ্গীরে মনে পড়ে কি তার
অথবা সেই পূর্ণ আকাশের বুকে উড়ে বেড়ানো দুরন্ত দুষ্ট মেঘ বালিকারে
কালো মেঘপুঞ্জের সাথে উড়ে বেড়তাম দুজনে দোহার কামনায় মিশে
কালো মেঘ বালিকারা এখন লুপ্ত প্রায় প্রজাতি শান্ত শুভ্র রোদেলা আকাশে
ভংয়কর তৃষ্ণার জল জোগাতে, ভেজাতে তপ্ত শরীর লুপ্ত হলো মেঘবালিকা
নিঃশেষ হওয়া ক্রিয়া কর্মে নির্ভয় আমি নারী, ভালবাসি পুরুষ তোরে।
অথচ ঝোপের ছায়াচ্ছন্ন গাছের ডালে ভূত হয়ে বসে আছিস তুই, ওরে
আমি একাকি শূন্য ঘরে, পার্থিব স্মৃতির ছুরিকাঘাতে, মৃত্যু হচ্ছে ভালোবাসার
তবুও আমার সকল প্রেম, ভালোবাসা তোকেই ঘিরে তুই আমার অহঙ্কার।

(৬)
শ্রাবণ বর্ষণে কিশোরী এক

পল্লীগায়ের নিথর দুপুর দাড়িয়ে আছে পুকুর পাড়ে, পদ্ম তখন দাঁড়িয়ে জলে
কবোষ্ণ জল গায়ে মেখে থমকে দাঁড়ায় পুব হাওয়া ছুঁয়ে দেখে কিশোরীরে
আকাশ জুড়ে শ্রাবণ মাসের কাজল মেঘ, উষ্ণ এখন নীল জলধি তপ্ত নীরে
মাথার ওপর নীলাম্বব আশে পাশে কালো জল, থমকে দাঁড়ায় সে কিশোরী,
সামনে একা অমল বালক, চোখে তার জলকেলির স্বপ্ন আছে পুলক ঘিরে
চোখের পাতা নড়ছেনা তার, বলছে বালক এসো সখি দু'জন মিলে সাঁতার শিখি
আর নড়ে না পায়ের পাতা, চল্‌কে ওঠে বুকের রক্ত ইশরায় তার সম্মতি
সাঁতার রেখে ঘাট কিনারে ওঠে দাঁড়ায় সে কিশোরী চলনে তার অসঙ্গতি
বসন ইষৎ মেলো পরনে তার ডুরে শাড়ি
বালক এবার এগিয়ে এসে বলে সখি, ভালোবাসা দাঁড়িয়ে থাকে পুকুর পাড়ে
সচল এখন হাত দু'টো তার, সক্রিয় সে ঘোরের মাঝে জীবন ডোবে ভালবাসায়
ভেঙে আকাশ বৃষ্টি নামে, সোঁদা গন্ধী বৃষ্টি ঝরে, ওরা এবার সুধাস্পর্শী কাব্যময়
বৃষ্টিপাতের শব্দ এখন রুম ঝুম, রুম ঝুম, মাঝে মধ্যে অন্যরকম জীবন শুধু স্বপ্নময়
শ্রাবণ বর্ষণে বালক এবার পুরুষ হলো, কেউ নেই কাছে আছে শুধু নীল জলাশয়
পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিন জল থৈ থৈ, কি আনন্দ, ওরা মত্ত বৃষ্টি মাঝে সৃষ্টি সুখে
দুজন তখন মহা ব্যস্ত জলের মাঝে, চারটি পায়ের মজার খেলা শ্রাবণ জলে

(৭)
নারী ও তার কামনা

অর্ণবসম আরাধনা মম, ফুলে ফলে দিয়েছি দেবতার অর্ঘ্য আমৃত্যু গৃহবাস
দোহার জীবনে চাইনি নিরাসক্তি অথবা সন্ন্যাস, সম্পূর্ন অকুণ্ঠ জীবন চেয়েছি আবাস
চেয়েছি স্বর্গসুখ, এই জীবনে, বৃত্ত হতে বৃত্তান্তর, সর্বত্র বিস্তার হোক মম আনন্দের
বসন্তের বাতাস, বর্ষার মেঘ, উষ্ণতা শীতের, কৃত পাপ থেকে মুক্তি অনুশোচনার
চেয়েছি তোমার মন জুড়ে অবস্থান আমার, তপ্তফোঁটা চোখের অশ্রু, অঝোর বৃষ্টিপাত
শ্রাবন মেঘের আঁধার চেয়েছি, শুষ্ক শীতে উষ্ণতার গাঢ় আলিঙ্গান, জমাট অবাধ
প্রতি নিঃশ্বাসে শুধু বুকে এই বোধ, আমি নারী প্রার্থী নই কারো কামনার
শুধুই শরীরী নয়, চাই উষ্ণীষ চুম্বন, গার্হস্থ্যপ্রেম যা শুধুই জীবন আর ব্যাকুলতার
আজ এই ভালটুকু চাই, চৈত্রে দীপ, আলম্ব ভালবাসা আমার কাংঙ্ক্ষিত সখার
রক্ত মাংসের মন্দির চত্বরে কালো স্পর্শ দিয়ে, তুমি সখা নরক করোনা পৃথিবীরে
প্রিয়তম, আজ কোনও সন্ন্যাস নয়, শুধুই গৃহবাস, প্রবেশ করো উষ্ণ হৃদ মন্দিরে

(৮)
নারী ও সৌভাগ্য রজনী

সকল কাজের ফাঁকে সৌভাগ্য রজনীর সন্ধ্যা রাতে পুণ্য অবগাহন সেরে
এক নারী আজ পৃথিবীর কোলাহল থেকে অনেক দুরে আল্লাহ্‌র দুয়ারে
মসজিদে উদাত্তগলায় কারীসাহেব পড়ছেন পবিত্র সেই গ্রন্থ, নারীটি খুবই এস্ত
'তুমি আসছ না কেন প্রভু, এস এখানে, শোন তোমার আরাধনায় বান্দি আজ ব্যস্ত'
অন্যদিন আমি যে থাকি আগুনের কাছে, রান্নার কাজে, এখানে বাসন কোসন শত শত
অপেক্ষা করে আমার জন্যে ধোঁত হবে বলে, যদি ব্যাতয় ঘটে তাই আমি থাকি সন্ত্রস্ত
তারপরও আগামী কালের, শত শত কাজ ওরা অপেক্ষায় থাকে, আমার জন্যে
কাজ সেরে শ্রমে ক্লান্ত হয়ে আসা আমার হাত দুটো নিয়ে অপেক্ষা করি তোমার জন্যে
একটু সময় পেলে তোমার গ্রন্থের পাতা ওলটাই পবিত্র হৃদয় নিয়ে, নত হই তোমর সনে
প্রভু হয়তো ফুরিয়ে যাবে আমার জীবন, পবিত্র গ্রন্থের আয়ু তবু ফুরাবে না,
আমার প্রভু তুমি নিশ্চয় আমার পাঠ শুনতে পাও, আমিতো রয়েছি তোমার রাহে
শেষ ভাগে রজনীর ঘুমতে যায় সবাই, নারীটি তখন ক্লান্ত চোখ তুলে দেখে পড়ে আছে টেবিল
গত রাতের ভুরিভোজের অসংখ্য বাসন কোসন হাড়ি পাতিল ধোঁত হবে বলে।

চাঁদপুরের চিঠি.....

সুপ্রিয় দেওয়ান আবদুল বাসেত ভাই,
সম্পাদক, মরুপলাশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানবেন। কামনা করি ১৪১৩ বাংলা সন আপনার জীবনে অনবিল শান্তি ও উন্নতি বয়ে আনুক। চাঁদপুর মাইক্রো ওয়েব যোগাযোগ ব্যবস্থায় হঠাৎ করে ত্রুটি ধরা পড়ার কারণে দীর্ঘসময়ে ইন্টারনেট যোগাযোগ বন্ধ ছিল। ইচ্ছা থাকা সত্বেও নববর্ষের লেখাগুলো সঠিক সময়ে আপনার নিকট পাঠাতে পারিনি। সে জন্যে আমরা দুঃখিত। আজ সকালে আপনার ই-মেইল ঠিকানায় কিছু লেখা পাঠিয়েছে। এ পত্রের সাথে আরো কয়েকটি কবিতা ও লেখা পাঠালাম।

ধন্যবাদ
আসিফ ইসলাম
ও
প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাই কম্পিউটার
চাঁদপুর
বাংলাদেশ।
১লা বৈশাখ ১৪১৩বাঙলা
১৪এপ্রিল ২০০৬ইং

এই বৈশাখে

সেলিনা জাহান

বৈশাখ আসে-
গুমোট গরম, তুমুল বর্ষণ,
বৈরী হাওয়া, আম বাগানের ম-ম গন্ধ
শিলা বৃষ্টির বরফ কুড়ানো
সুযোগটাও আসে-
তা লুফে নিতে আসে না কেউ
আধো জানালায়, আমিও নির্বিকার
তোদের ছাড়া কি বরফ কুড়ানো জমে?
দুচোখে গলিত জলের ধারা
আসে নিঃশব্দ কথনে
কেবল তোরাই আসিস না
আমার চুনি, পান্না, হীরা খচিত দিনের সাথী
এই বৈশাখে
কাঁচা পাকা আমের সাথে
শিলা বৃষ্টির বরফ কুড়োনো
সুযোগটা লুফে নিতে।

বৈশাখী মুখপত্র

ইদ্রিস আলী মেহেদী

পাঁচশত কোটি বসতির ভুখন্ডে
ধ্বংসরীজ খুব বেশী উর্বরতা মাখা-
পৃথিবীর আনাচে-কানাচে
আপনা আপনি ফুটে নষ্ট ফুল
ছড়ায় দুর্গন্ধ দ্রুত ইথার জগতে।
অর্থহীন রোষানল, ইগো-ভিত্তিক
নগ্ন অহঙ্কারে
জিম্মি আজ সুশীল মানবতা-
মাদার তেরেসার বরনীয় নাম
তাহলে কি এরা শুনেনি কখনো?
শক্তিদম্ভে তাইতো করেছে তাক্
আধুনিক সমরাস্ত্র
অসহায় শিশু ও নারীর ক্ষুধার্ত দেহে;
সভ্যতার শুভ্রতায় কলঙ্কিত হলো
নতুন মিলেনিয়ামঃ
সুরভী, তুমিও নেই পাশে-
কথা ছিলো আসন্ন বৈশাখে
তোমার কোমল দুটো হাত
মেহেদীর আলপনায়
চিত্রশিল্পে এনে দেবে নতুন 'ইমেজ'
আরাধ্য তিথির শুভলগ্নে
কোথায় হারালে প্রিয়তমা।
ধুধু মরুপথে একা ফেলে।
চারিদিকে অনাচার-ব্যূহ কি করে ভাঙ্গি!
সুরভী, চলে এসো তড়িঘড়ি
নাইবা হলো বেনারশী পরা-
তোলা থাক
আগামী বৈশাখে যদি মেলে ফুরসত!
এসো এখন দু'জনে মিলে
ঘৃণার গান্ডিব ছুঁড়ি
যুগের হিটলারের দেহে।
এবারের বৈশাখ হউক
অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার মুখপত্র।

দেওয়ান আবদুল বাসেত এর
বৈশাখী ছড়াগুচ্ছ

প্রবাস জীবনে ভিন্নভাষাসংস্কৃতির মাঝে ভিন্নমাত্রার বর্ষবরণ (পহেলা বৈশাখ) আমার কাছে যেভাবে ধরা দিয়েছে

৩.

বর্ষবরণ ১৪১৩বাঙলা

(সংগ্রামী কানসাটবাসীদের সঙ্গো একাত্মতা ঘোষণা করে)

চৌদ্দশ' তেরো
তুমি হয়ে এসো
কানসাটে এবার
বিষমাখা ছুরি 'এ্যারো'!!

তুমি হও ক্ষিপ্ত
প্রচন্ড ঝড়ে লিপ্ত,
ভেঙ্গো দাও হাত
ভেঙ্গো দাও দাঁত
বিরাণ কানসাটে হানো
শত্রুদের অপঘাত!!

আমার টাকার বুলেট তুমি
আমার বুকেই মারো!
দেখবো এবার গোয়ার্তুমি
আর কতোটা পারো!

তড়িৎ মন্ত্রী তুমি কহো
তড়িৎ চাইলে মারবে মানুষ
ছাড়বে তুমি কথার ফানুস
মৃত্যু কূপের চেয়েও এটা
নয়কি ভয়াবহ?!
মন্ত্রী তুমি কহ..

তাহলে কী মগের মুল্লুক
হয়ে গেলো দেশ!
দেখবো এবার আমরা সবে
ইহার কোথায় শেষ!!

২.

বর্ষবরণ ১৪১২বাঙলা

চৌদ্দশ' বারো
তুমি বর্ণিল হও আরো।
তুমি এসো
পিঁড়ি পেতে বসো।

এসো তুমি হাল দুখীদের
ছন্দ নিয়ে,
তুমি এসো চৈতী ফুলের
গন্ধ নিয়ে।

তুমি এসো তালপাতার অই বাঁশির সুরে
ঘণকালো মেঘের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে।
তুমি এসো পান্তা-মরিচ
ইলিশভাজা হয়ে,
এই প্রবাসে তুমি এসো তিলের খাজা হয়ে।

১.

বর্ষবরণ ১৪০৮ বাঙলা

(১৪০৮ বাঙলায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ঝরে যাওয়া তর-তাজা প্রাণগুলোর স্মরণে)

বোম ফাটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মূলে যাদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?

আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা এবং বাঙালিদের
ঘিন্না করে যারা!!

বর্ষ শুরুর মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ!

ওরে আমার পাগলা বাউল
কাল্‌বোশেখীর ঝড়,
সপ্ত আকাশ নিয়ে তাদের
উপর ভেঙে পড়!!

মরুপলাশ এর প্রার্থনা নতুন বছর সবার জন্যে হোক অনন্ত সাফল্যের আর অনাবিল আনন্দের। প্রযুক্তিমনা হয়ে উঠুক পুরোজাতি। প্রতিবাদী হোক সকল অন্যায় আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে।.........**মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা।।**

সমাপ্ত